Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual-Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-2 Issue-1 July 2023
ISSN 2583-6706 (Online)

অনিতা অগ্নিহোত্রীর নির্বাচিত ছোটোগল্প : অভিজ্ঞতা ও তার রূপায়ণ

মাম্পি দেবাংশী

Link : https://rb.gy/0nc6g

সারসংক্ষেপ : সাহিত্যিক অনিতা অগ্নিহোত্রী পেশাগত কাজে ও না-কাজে পূর্ব ও মধ্য ভারতের নানা স্থানে ঘুরেছেন। তাঁর ছোটোগল্পগুলি হয়ে উঠেছে সেইসব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার শিল্পিত রূপায়ণ। আলোচ্য নিবন্ধে নির্বাচিত তাঁর লেখা কয়েকটি গল্পকে কেন্দ্র করে এই বিষয়টিকেই স্পষ্ট করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ : প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, শ্রেণিবিভাজন, বঞ্চনা, অস্ফুট কণ্ঠস্বর, নারী শোষণ, প্রতিবাদ।

নগর জীবনের মিথ্যে সুখভোগে নিশ্চিন্ত না হয়ে সত্যিকারের মানুষ ও তাদের জীবনের অনুসন্ধানে যিনি সারাজীবন নিযুক্ত রেখেছেন তাঁর মননকে, ঝাঁ চকচকে উন্নত প্রযুক্তিপূর্ণ লাইফস্টাইলের নীচে লুকিয়ে আছে যে যন্ত্রণা অভাবপূর্ণ জীবনগাথা, তাকে সাহিত্যে তুলে এনে 'দেশের ভিতরে দেশ'কে দেখাতে চেয়েছেন এই সময়ের অন্যতম সাহিত্যকার অনিতা অগ্নিহোত্রী। সাহিত্যিক অনিতা অগ্নিহোত্রী কলকাতার মেয়ে। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর পড়াশোনা। 'মহুলডিহার দিন' (১৯৯৬), 'অতলস্পর্শ' (২০০৬), 'আয়নায় মানুষ নাই' (২০১৩), 'মহানদী' (২০১৫), 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প' (২০১৮), 'কাস্তে' (২০১৯) ইত্যাদি চল্লিশটি বইয়ের রচয়িতা অনিতা অগ্নিহোত্রী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সম্মাননা, শরৎ পুরস্কার, গজেন্দ্র মিত্র স্মৃতি পুরস্কার-সহ নানা সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। পেশাগতভাবে আইএএস এই সাহিত্যিক কাজে ও না-কাজে ঘুরেছেন পূর্ব ও মধ্য ভারতের নানা স্থানে। তাই স্বভাবতই প্রত্যন্ত অঞ্চলের অচেনা মানুষ, শহরের অকরুণ বাস্তব, অস্ফুট ভারতবর্ষের স্বরের বিন্যাস চালচিত্রের মতো এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর লেখায়। তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎ, কর্মজীবনের ছাপ পড়েছে তাঁর সাহিত্যকর্মে। প্রশাসনিক স্তরের উচ্চপদস্থ আমলা হিসাবে তিনি রাষ্ট্র ও সিস্টেমকে অনেক কাছ থেকে দেখেছেন, দেখেছেন সিস্টেমের ভিতরে থাকা নানা ত্রুটি-বিচ্যুতিকে, যা সমাজের নানা স্তরের মানুষের জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করেছে। সিস্টেমের মধ্যে থেকে সিস্টেমের পরিবর্তন করা — এই বিরাট তত্ত্বে বিশ্বাসী না-হয়ে মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য তিনি সিস্টেমের মধ্যে থেকে কাজ করে গেছেন। প্রয়োজনে কখনো রাষ্ট্রের বিরোধী হয়েছেন, নন্দীগ্রামে নিরস্ত্র মানুষের হত্যার প্রতিবাদে ফিরিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সোমেন চন্দ পুরস্কার। আবার রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে কখনো কখনো তাঁকে সাধারণ মানুষের চক্ষুশূলও হতে হয়েছে। বাতানুকূল অফিসে বসে টেবিলে ফাইল সই করে নিশ্চিন্তে জীবন কাটাতে পারতেন। পরিবর্তে এই লেখিকা প্রতি মুহূর্তে নিজেকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ছুঁড়ে দিয়েছেন। প্রসাধনচর্চিত ভারতবর্ষের মুখের অন্তরালে যে কঙ্কালকীর্ণ মুখটি রয়েছে — তা প্রকাশ করার দায়বদ্ধতা তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে নানা গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সত্তর বছর পেরিয়েও এই অবক্ষয় থেকে মুক্তির কোনো চিহ্ন নেই কেন? তাঁর সাহিত্যকর্মের নানা চরিত্রের মুখে উঠে আসে এই প্রশ্ন, বিশেষত গল্পে। প্রায় দেড় দশক ধরে লেখা তাঁর 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প' বইয়ের গল্পগুলিকে পাকে পাকে জড়িয়ে রয়েছে নানা নদী, পাহাড়, অরণ্য, মানব-মানবীর জীবন, আনন্দ-বিষাদ তথা তাঁর দেখা ভারতবর্ষ। বইটি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন —

"কাজ ও সংসারের বাইরে প্রবহমান এক সমান্তরাল পৃথিবীতে বাস করতাম এই গল্পগুলো লেখার সময়; নিজের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ, বেঁচে থাকার হর্ষ বিন্দু বিন্দু ঝরে মিশে গেছে অক্ষরমালায়।"[১]

অনিতা অগ্নিহোত্রীর অর্জিত অভিজ্ঞতার সংহত শিল্পরূপ কীভাবে এই ছোটোগল্পগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে এখানে তা এই প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করা হবে।

ISSN 2583-6706 (Online)

'সেরা পঞ্চাশটি গল্প' বইয়ের প্রথম গল্প 'অংশুঘাত'। এ গল্পের পটভূমি উঠে এসেছে তাঁর ওড়িশাযাত্রা থেকে। ওড়িশার বরগড় ও কালাহান্ডির প্রত্যন্ত গ্রাম ফুলাপালি-খইরপদর। সেখানে তিনি তাঁতশিল্পী কারিগরদের জীবন-জীবিকা যেমন কাছ থেকে দেখেছেন তেমনি দেখেছেন চৈত্র শেষের খর রোদ ও দাহে পুড়তে থাকা জেলা। তিনি লিখেছেন —

"বাইরে পা রাখলে তক্ষুনি কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু মিনিট খানেকের মধ্যেই স্নায়ু সকল অভিভূত করে দেয় বিপুল তাপ। তাপ না বলে দাহ বলাই ভালো। বাষ্পবিহীন রৌদ্রহীন সাঁড়াশি যেন অন্ত্রের ভিতর থেকে শেষতম আর্দ্রতাটুকু বার করে আনবে।... কিছুক্ষণ রোদে হাঁটলে মাথা টলতে থাকে, তৃষ্ণার মতন সূক্ষ্ম অনুভূতি উবে গিয়ে গলা মাথা বুক পেট জোড়া খাঁ খাঁ শূন্যতা নিঃশব্দে চিৎকার করতে থাকে।"[২]

ঠিক এই আবহাওয়াতেই হিমশিম খেয়ে উঠেছে 'অংশুঘাত'এর নায়ক স্বদেশ। সুবর্ণপুরে প্রতিবছর শয়ে শয়ে লোক মরে চরম প্রতিকূলতায়, বিপন্ন কর্মচারীরা ক্রুদ্ধ-ধর্মঘটী তাই। সেই রোষকে শান্ত করতে সরকারি প্রতিনিধি হিসাবে স্বদেশের আগমন। আপাতভাবে স্বদেশ ওইসব নীচুতলার কর্মচারীদের কষ্টে ব্যথিত হন, তাদের কষ্ট-যন্ত্রণা তাঁর মনকে নাড়া দেয়, কিন্তু ঘণ্টাখানেক অ্যাসবেস্টসের ছাদের তলায় কাটানোর পরই তাঁর মনে হয় মানবাধিকারের জন্য নিজে শহীদ হওয়া মুশকিল। কালাহান্ডির খাঁ খাঁ পটভূমিকায় বিবেক ও ব্যক্তিস্বার্থের তীব্র টানাপোড়েনকে নিখুঁতভাবে এঁকেছেন লেখিকা। ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগে নিজের চোখে যাদের নিদারুণ কষ্ট দেখে নায়কের মন সহানুভূতিশীল ছিল, শহরের বাইরে ভরপেট মাংসভাত খেয়ে তাঁর মনের বিবেকবোধটুকু বিলীন; তার পরিবর্তে মিথ্যে অহংকার ও উপকারবোধে নিজের পিঠ চাপড়ে নিতে চান তিনি। 'খইরপদর শিল্পী গ্রাম পেরিয়ে' লেখিকার অনুভূতি — ধুলোট গ্রামটি অপ্রসন্ন মুখে দাঁড়িয়ে ছিল এই ভেবে তিনি হয়তো কখনো ওখানে আর ফিরে যাবেন না। এই সম্ভাবনাই নিশ্চিত হয়েছে স্বদেশের মধ্য দিয়ে। হ্যাঁ, এইসব অফিসাররা কোনোদিন স্বেচ্ছায় আর সুবর্ণপুরের তাপে গা পোড়াবেন না। প্রশাসনের নিয়মকার্য পালনের ক্ষেত্রে যাঁরা তৃণমূল স্তরে কাজ করেন তাঁদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সরকারের কি কোনো দায় ছিল না? রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হয়েও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই জোরালো সওয়াল করেছেন গল্পকার অগ্নিহোত্রী। 'অংশুঘাত' গল্পের মাধ্যমে তিনি দেখাতে চেয়েছেন প্রত্যন্ত বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নের কাজ করতে গেলে দরকার তৃণমূল পরিসরে প্রয়োজন ভিত্তিক যোজনা, তার রূপায়ণ এবং স্থানীয় গণতান্ত্রিক সংগঠন বিকাশ আর এইসব দক্ষতা আমরা এখনো শিখে উঠতে পারিনি।

গল্পকার ২০০৭ সালের সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের কৃষি বনাম শিল্পের দ্বন্দ্বে জমি অধিগ্রহণ দেখেছেন। আবার ওড়িশায় গিয়ে নগরায়ণের যে বিরূপ প্রভাব আয়ত্বের বাইরে, তা দরিদ্র কৃষকদেরই সবচেয়ে আগে ক্ষতিগ্রস্ত করে। জগৎসিংহপুর জেলার লুনকুয়া গ্রামে আর কৃষিকাজ হয়না। পারাদ্বীপ বন্দর ও এক্সপ্রেসওয়ের আওতাভুক্ত হয়েছে অনেকের চাষের জমি। ইস্পাত কারখানা পস্কোর জন্যও জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, কুজঙ্গ ব্লকের আশেপাশের সবক'টি গ্রামের বাতাসে ছড়িয়ে গেছে অনিশ্চয়তা ও বিপন্নতার বারুদগন্ধ। এরই মাঝে মুখ থুবড়ে পড়েছে কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্প, স্থানীয় মানুষ পস্কোবিরোধী আন্দোলনে জোট বেঁধেছে। আবার জমি অধিগ্রহণেরই আর এক ভয়ঙ্কর রূপ দেখেছেন মহারাষ্ট্রে, বিকট পাঁচিলে ঘেরা SEZ (Special Economic Zone) যেন দেশের ভেতর আরেক দেশ, যার কারণে মানুষের বহুদিনের পায়ে চলা ঘাট গ্রাম্য রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। আর এইসব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই 'ছায়াযুদ্ধ' ও 'সতেরো বছর বয়স' গল্পের পটভূমিকা রচনা করে দিয়েছে। 'ছায়াযুদ্ধ' গল্পের মূল বিষয় আদিবাসীদের জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে তৈরি বিবাদ। পুলিশের গুলিতে নিহত বারোজন আদিবাসী, এইসব মৃত মানুষের পরিচয় লুকোতে ছয়-সাতটি লাশের হাত কেটে নেওয়া হয়েছে। একই নৃশংসতা দেখতে পাই 'সতেরো বছর বয়স' গল্পটিতেও। এই নারকীয় কাণ্ডের প্রতিবাদে গ্রামের নিরক্ষর আদিবাসীরা মশাল নিয়ে শহরের মিছিলে হাঁটছে, তাদের মুঠো করা হাত, ফুলে ওঠা কপালের শিরা, চেনা মানুষগুলো বদলে গেছে যেন। ওদের প্রতিবাদের আগুনের সামনে গম্ভীর ও করুণ দেখাচ্ছে পুলিশের অবয়ব। অপমানিত ও ক্ষুব্ধ মানুষগুলি হলো আমাদের সমাজের তথাকথিত নীচু শ্রেণির মানুষ। এরা সব অত্যাচার-শোষণ মুখ বুজে সয়ে নেবে এমনটাই তো রীতি। কিন্তু তা হয় না। জুলিয়াসদের প্রতিহিংসার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে ঋত্বিক তিথিরা। একদিকে সারি সারি লাশ অন্যদিকে স্বামীর প্রতি কর্তব্যবোধ — এই দুইয়ের মাঝে তিথির মন ধাক্কা খেতে থাকে বারবার, দাম্পত্যে এসে জড়ায় মলিনতা। তবে তিথিদের এই বিবেক মানবতাবোধ নেহাতই সাময়িক। ধীরে ধীরে খবরের কাগজের

Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual-Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
ISSN 2583-6706 (Online)
Volume-2 Issue-1 July 2023

রিপোর্টিং শুরু হয়, বিধান সভায় উত্তেজনা কমে, ব্যস্তানুপাতিকভাবে তদন্ত কমিশনের কার্যকাল দীর্ঘ হয়। রক্তের দাগ মুছে যায়, সম্পর্কের ফাটল জুড়ে যায়। তিথিরা আবার ছেলের সর্দিকাশি, কলকাতার পলিউশন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তবুও কোনো একদিন বৃষ্টির রাতে জুলিয়াসদের জ্বলে ওঠার ভয়ে কেঁপে ওঠে তিথিরা। বৃষ্টিতে আধ মাইল হাঁটানো, মিনিট পনেরোর আতঙ্ক — ব্যস, এর বেশি তো বদলা নেওয়ার ক্ষমতা ওই নীচুতলার মানুষগুলোর নেই। ওরা কোনো কিছু হারালে আর ফিরে পায় না — যেমন জুলিয়াস পায়নি তার ভাইকে। 'ভয় ও ভাবনার অতীত ছায়ামূর্তি' এই জুলিয়াস তথা নিম্নশ্রেণির গর্জে ওঠা মানুষের কারণেই তিথিদের ভিতরে একটা মানসিক যুদ্ধ চলে দিনরাত। জুলিয়াসকে সে সহানুভূতি সান্ত্বনা দিতে চায়। কিন্তু পোশাকের আড়ালে খুনি স্বামী ঋত্বিকের হাতের রক্ত তার গায়েও লেগে রয়েছে, তাই চাইলেও পারে না।

২০০৬এর ২২ ডিসেম্বর, গল্পকার অনিতা এসে পৌঁছলেন রেশম কীটের শহর বহরমপুরে। ভূমিহীন রেশম তাঁতশিল্পীরা পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ টাকা মজুরিতে সারাদিন খাটে। তাঁতিরা না পায় সুতো, না পায় সময়মতো মজুরি। তার উপর সুবিধাবাদী স্থানীয় মহাজন তার দাদনের জাল ছড়িয়ে দেয় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। তাদের চড়া সুদের হার, আসল তারা ফেরত চায় না, পাকে পাকে জড়িয়ে নিঃশব্দে হজম করার চেষ্টা করে আস্ত মানুষগুলিকেই। 'উষ্মকোঠি' গল্প সেই শ্রেণিশোষণেরই সাক্ষী। পড়াশোনার ইচ্ছেকে গলা টিপে মেরে পুবি চল্লিশ টাকা দিনমাইনের সুতো কাটে। গল্পকার এখানে রেশমগুটির সঙ্গে পুবিদের খেটেখাওয়া জীবনকে মিলিয়ে দিয়ে এক অসাধারণ শিল্পব্যঞ্জনা টেনে এনেছেন। উষ্মকোঠির ভিতর শয়ে শয়ে মথরা তসরগুটির মধ্যে সিদ্ধ হয়ে দগ্ধে মরে, তেমনি সমাজে পুবিদের জীবনও দাসবাবুদের অত্যাচারের উষ্মকোঠিতে ঝলসে যায়। এই গল্পেই আমরা দেখেছি ভিনরাজ্যের ঠিকেদার এসে দাদন দেয়, পাঁচশো ছ-শো হাজার লোককে ট্রাকে চাপিয়ে নিয়ে যায় ইঁটভাটার কাজে। 'মনে পড়ে যাওয়া' গল্পেও একই স্মৃতি, বালুর মাকে ধুলো উড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে ট্রাকটা। পুবি-বালুদের মা বাবারা ঠিকেদারের কাজ করে টাকা পাঠাবে, ছয় মাস অন্তর পাঠানো সেই মনি অর্ডারে লেগে থাকবে বাবা-মার বেঁচে থাকার ইঙ্গিত। ভিনদেশে ছাউনির মত সারি সারি ঘরে গাদাগাদি করে লোক থাকে, অনেকে বউ-বাচ্চাও নিয়ে যায়, অনেকে যায় না। সেখানে বড় কষ্ট, সেই কষ্ট রচনাকার নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন বীড জেলার চিনিকলে কাজ করতে আসা হতশ্বাস মানুষগুলোর মধ্যে। দরজাহীন পাতার তৈরি ঝুপড়িতে কুকুর বিড়ালের এঁটো খেয়ে ওদের দিনগুজরান। এই লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন উদ্বাস্তু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কোন কণ্ঠস্বর নেই। মেয়ে-বউদের আব্রু সংকটাপন্ন। শরীরের ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লেও দাদনে খাটতে আসা মেয়েদের নিশ্চিন্তে চোখের পাতা এক করার উপায় নেই। যখন-তখন আক্রমণ নেমে আসবে শরীরে — সে হোক না এক বা দুই সন্তানের মা কিংবা বাইশ তেইশ বছরের শ্রমিকবধূ। দাদনে খাটতে আসার আগে তারা বন্ধ্যাত্বকরণ করিয়েই আসে। এই ভয়েই পুবিকে তার বাবা ভিনরাজ্যে নিয়ে যায়নি, কিন্তু নারীশোষণ তো আর রাজ্য-দেশ-সময়ের সীমায় আটকে নেই, তাই পেটে খিদের সুযোগ নিয়ে দাসবাবুদের মুহুরী বসন্ত পুবির শরীরের মাংস খুবলাতে চায়। অল্পবয়সের বোকাসোকা মেয়েটাও কান্নার ডেলাটা গলায় চেপে বুঝতে পারে ওর খিদের সঙ্গে বসন্তের থাবাটার কোনো একটা সম্পর্ক আছে। দিল্লি থেকে কামদুনি নারীর উপর ক্রমবর্ধমান হিংসার বিরুদ্ধে শাণিত প্রতিবাদ জানিয়েছেন গল্পকার। ফুটপাতে পড়ে থাকা বলকা দুবেলা ভর্তি পেটের স্বপ্ন দেখে কিন্তু বিশ্বাস করতে সাহস পায় না। বলকার মাকে সবাই পাগলি বলে, ওই পাগলিটাকেও লালসার শিকার হতে হয়েছে, বলকার কথায় —

"আজও ঘুমের আগে ওই ভয়টা গলা চেপে ধরে বলকার। তখন ভয়ে শীত করে, চোখে জল আসে রাগে। আবছা মতো করে এখন ও জানে, ওই গোঙানিটা কীসের। মা নিজে যায়নি।... মাকে কে কোথায় টেনে নিয়ে গেছে কে জানে! ছিঁড়েখুঁড়ে রান্না করে খাবে কুকুরেরা মিলে।"[৩]

লেখিকা তাঁর 'দেশের ভেতর দেশ' বইয়ে 'আমাদের কথা' অংশে তাই পণ করেছেন — ইস্পাতের যোনি নিয়ে জন্মাবে এবার দেশের প্রতিটা মেয়ে, কোনো নারীর আগে ধর্ষিতা লাঞ্ছিতা বিশেষণগুলো বসবে না, নারী হবে আক্রমণ-উর্ত্তীণা। লোহার পাতে মোড়া আমাদের শরীরের আলিঙ্গানের চাপে চুরমার হয়ে যাবে প্রতিটা ধর্ষক, হিংসক।

অনিতা অগ্নিহোত্রী রাঙাবেলিয়া যাওয়ার পথে সুন্দরবনের সৌন্দর্য আঙুলে মেখেছেন আর সেই আঙুল বুলিয়েছেন 'অতলস্পর্শ' গল্পে। তিনি দেখেছেন নদীর গতিপ্রকৃতির সঙ্গে বদলে যায় মানুষ। সুন্দরবনে এসে তাঁর অন্যরকম অনুভূতি, সে অনুভূতি যেন নলিনীর অন্তরভাষ্যে প্রকাশ পেয়েছে — কলকাতার বিদ্যুৎ, পানীয় জল, পথঘাটের জৌলুস, শপিং কমপ্লেক্সের বিভা

Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual-Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
ISSN 2583-6706 (Online)
Volume-2 Issue-1 July 2023

— সব ত্যাগ করতে করতে যেন চীরবাস ধরতে যাচ্ছে সভ্যতা। কাদার উপর ছুঁচোলো পেরেকের মতো শ্বাসমূলে ঘেরা সুন্দরবনের প্রকৃতি বর্ণনায় গল্পকার লিখছেন —

"আলো আর ছায়া। রোদ আর জল। নদী আর জঙ্গাল। সুন্দরী, গরান, কেঁদ ও হেঁতাল জঙ্গাল আজও জাগে। জল সরে গেলে তীরের কাদায় মাথা তোলে শ্বাসমূল। সারি সারি ওলটানো নৌকোয় ছলাত করে এসে লাগে জোয়ারের জল। দিনে রাতে জোয়ার ও ভাটার খেলা। চাঁদ-পৃথিবীর টান, অভ্রান্ত সময়ের নিয়মে।... মথুরাখণ্ড, আমলামেথি, বানী, সোনাগাঁ, পাখিরালা হয়ে সাধুপুর হ্যামিল্টনাবাদের কাছে, গোমর হয়ে গেছে সজিনা, বিদ্যা, করতাল, মেলমেল, গোঁড়াল, গোমর — নদীদের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে মানুষের জলগন্ধী ঘরবসত।"[৪]

আবার ক্যানিংয়ে ভাটার সময় মাতলার বুকে খাঁ খাঁ করা সৌন্দর্যও উপভোগ করেছেন। আনন্দ ও ভয় মেশানো সে অভিজ্ঞতা গল্পকথক 'অতলস্পর্শ'এর অতীনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করেছেন।

এই গল্পেরই অন্যতম প্রধান চরিত্র জগদীশ মাস্টারমশাই, যাঁকে গল্পকার কলকাতা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের উল্টোদিকে রেখে বোঝাতে চেয়েছেন মানুষের কষ্ট যন্ত্রণার ব্যাখ্যা কোনো ইতিহাস-ভূগোল প্রত্নতত্ত্ব পড়ে পাওয়া যায় না, সত্যিকারের ভারতবর্ষকে জানতে হলে পৌঁছে যেতে হবে আঁশটে গন্ধ, প্যাচপ্যাচে কাদা আর বিদ্যুৎহীনতায় ভোগা ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে। মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় গল্পকার সঙ্গী হয়েছিলেন বর্ষা দেশপাণ্ডের। দলিত বিকাশ সংগঠনের নেত্রী বর্ষা দুই দশক ধরে গর্ভস্থ শিশুর লিঙ্গনির্ধারণ ও কন্যাভ্রূণহত্যার বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছেন। পশ্চিমবঙ্গের কামদুনিতে ধর্ষণের ঘটনার পর ওখানকার মেয়েরা একজোট হয়ে বেআইনি চোলাই ভাঁটিগুলোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। বর্ষা দেশপাণ্ডের চরিত্র ও কামদুনির ঘটনার সংমিশ্রিত ছাপ দেখতে পাই 'অতলস্পর্শ'র জগদীশ মাস্টারের মধ্যে। হিংসা ও সমাজবিরোধীমুক্ত পরিবেশ মানুষের জন্মগত অধিকার আর এই বিষয়কে লক্ষ্য করেই জগদীশ মাস্টার গ্রামের সব ভাঁটিখানা বন্ধ করার পণ নিয়েছেন, মেয়েদের স্বনির্ভর করতে সমিতি গঠন করেছেন। চল্লিশ বছর আগে স্ত্রী ও সদ্যোজাত কন্যাকে নিয়ে স্কুলে পড়াতে আসা মাস্টারমশাই —

"কলকাতার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মতন চক্রব্যূহ থেকে নিষ্ক্রমণের মন্ত্র চাননি বলে শিকড় মেলে ডানা গুটিয়ে রয়ে গেছেন এখানকার ভাঙন, দারিদ্র্য, অপুষ্টি, উপায়হীন জীবনযাপনের মধ্যে। মানুষকে জেনে, আপন করে নিয়ে ক্রমাগত বুনে চলেছেন পরিস্থিতিকে জয় করার নানা সংগঠন কৌশল।"[৫]

প্রসঙ্গাত বলা ভালো, রচনাকার যখন কোনো চরিত্রকে নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে গ্রহণ করেন তখন তিনি তার সবটুকু নেন না, যেমন জগদীশ মাস্টারমশাইয়ের মধ্যে বর্ষা দেশপাণ্ডের একটা প্রভাব রয়ে গেছে তেমনি এ গল্পের পার্শ্বচরিত্র সুভদ্রার মধ্যেও ওড়িশার জগৎসিংপুর জেলার সেই নাম-না-জানা মুখরা মেয়েটির আদল রয়ে যায়। ১৯৯৯এর মহাবাত্যার পর অভাব যখন সামনে ফণা তুলছে তখন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'অপরাজিতা'র হাত ধরে মেয়েরা পোড়ামাটির কাজ শিখে স্বনির্ভর দল গঠন করেছে। গল্পের সুভদ্রাকে তার বর বেচে দিয়েছিল, খদ্দেরের হাত থেকে পালিয়ে এসে দিদিমণির হাত ধরে মহিলা সমিতিতে ঢুকেছে। শুধু নিজে নয়, তার মতো অনেক মেয়েকেই ঘুরে দাঁড়াতে শিখিয়েছে সুভদ্রা।

সুন্দরবনের সমৃদ্ধিভরা রূপ যেমন লেখিকা দেখিয়েছেন পাশাপাশি আয়লা পরবর্তী দুর্ভোগ হাহাকার করা সুন্দরবনের ছবিও তুলে ধরেছেন এবং তারই ছায়ায় সমাজের দুই শ্রেণির পার্থক্যকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। 'গরমের ছুটি' গল্পে সাত্যকি ছুটি কাটাতে বিদেশ এসেছে ছেলের কাছে, সেখানে চারিদিকে সুখ সমৃদ্ধি স্বাচ্ছন্দ্য ঝলমল করছে। এত ঐশ্বর্যপূর্ণ বিলাসের মাঝেও সাত্যকির মনে ময়নার মাধ্যমে হানা দিয়েছে বিপর্যস্ত দেশের জীর্ণ ছবি। সাত্যকির বাড়িতে রান্নার কাজ করা মেয়েটির বাড়ি সুন্দরবনে। আয়লার ঝড়ে তার গ্রাম ভেঙেচুরে তছনছ, জলের জন্য হাহাকার করছে লাখ লাখ মানুষ, তেষ্টায় ছটফট করে মরা দুধের শিশুটার দিকে বোবা তাকিয়ে বসে আছে কিশোরী মা, ময়নার ছোট ভাইটাও নিখোঁজ। গল্পকার আয়লার এই অতর্কিত তীব্র আক্রমণের দুর্ভোগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন —

"... মানুষকে তৈরি হবার সময়ই দেয়নি। ঘরের বিছানার চাদর থিকথিকে মাছিতে কালো, ভীষণ মশা, মানুষ পশু কারও

ISSN 2583-6706 (Online)

খাওয়ার জল, স্নানের জল, শৌচের জল নেই।... তেষ্টায় ছটফট করছে দূর-দূরান্তের মানুষ... জল, ত্রাণ নদীর তীর পর্যন্ত পৌঁছনো গেছে, কিন্তু অন্তর্বর্তী এলাকায় পৌঁছবার মতন পরিকাঠামো ছিল না।"[৬]

যখন সাত্যকি কাচের গ্লাসে নতুন কেনা ফিল্টারের ঝকঝকে জল ছেলেকে দেবার কথা ভাবেন তখনই ময়নার তৃষ্ণার্ত মুখখানা তার মনের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে আসে। সে মুখ ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ। ঐশ্বর্য আর প্রাচুর্যভরা জীবনে অভ্যস্ত শহুরে মানুষগুলো সিডিউলপ্রিয়, প্রয়োজনের বেশি জিনিস কেনা যেন তাদের রক্তে মিশে গেছে। আর ঠিক এরই উল্টো প্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রান্তিকরা জলে ভরা রাঙা চোখ নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত মুখে হাতড়ে বেরোয় নিজের ভাইয়ের লাশ। সাত্যকিরা ভাবতেই পারেন না ময়নাদের দুর্দশার বাস্তবতা। এদের কাছে পশ্চিমবঙ্গের দুর্দশার যন্ত্রণার খবর জমে যাওয়া ঠাণ্ডা লাভার টুকরোর মতন জেগে ওঠে, জ্বালায় পোড়ায় না। কলকাতার বাইরে হাহাকার করা এইসব অঞ্চল যেন তাদের নিজের দেশ নয় — সিনেমার ডকুমেন্টারিতে দেখা অচেনা মানুষের অজানা জীবন। এইভাবে একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগকে কেন্দ্র করে রচনাকার একটি দেশ ও দেশের মানুষের শ্রেণিবিভাজনকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

২০০০ সালের অগস্ট মাস, সংসদীয় নির্বাচনের পর্যবেক্ষক হয়ে অনিতা অগ্নিহোত্রী গিয়েছিলেন বুন্দলখন্ড, পুতরপুর ও টীকমগড় জেলায় বিস্তৃত খাজুরাহো লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রে। খাজুরাহো মন্দির ও তার নামকরণের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভূমিহীন প্রান্তিক মানুষের জীবনের কথাও ব্যক্ত করেছেন। আবহমান ভারতবর্ষের জীবনোল্লাসের প্রতীক এইসব মৃৎসন্তানদের মধ্য দিয়ে চিনে নিতে চেয়েছেন খণ্ড খণ্ড ভারতবর্ষকে। 'খেলাঘর' গল্পের দোকান, চিনির গুদামে মুটেগিরি করা বাগান মণ্ডল তারই প্রতীক। ছতরপুর গঞ্জের নির্ধন আদিবাসীদের মূল জীবিকা খয়ের বানানো। কিন্তু জঙ্গল কমে যাওয়ায় জীবিকার খোঁজে বর্তমানে তাদের দেশ ছাড়তে হয়। বছর বছর নির্বাচন হয়, রাজা আসে, রাজা যায়; প্রকৃতির সবল অন্যমনস্কতার ছবি যেমন পাল্টায় না ছতরগঞ্জের এই বিজন অরণ্যে, তেমনি পাল্টায় না অন্ত্যজ-নির্ধন মানুষের জীবন। গল্পে সেই ভূমিপুত্রদের শৈশবের প্রতীক খয়েরগাছের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন তাদের জীবনযাপনকে —

"প্রপাততীরের জলে-ভেজা খয়েরগাছ দুটির মতন নিরাসক্ত অথচ সুখী মানুষ। একটি প্রশ্নের উত্তরে একের বেশি দুটি শব্দ খরচ করে না। তবু কথায় কথায় সে জানায়, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য ও জীবিকাহীনতার কথা। উপজাতি ও নিম্নবর্গের মানুষ, যারা দারিদ্র্য ও জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ, তারা প্রায় সারা বছর কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়ায় উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে। সপরিবারে, ছিন্নমূল হয়ে অন্যত্র বসত করে। মাসের পর মাস শিশুরা স্কুলে যায় না, মাসের পর মাস তাদের ঘর পড়ে থাকে ভাঙাচোরা, অন্ধকার।"[৭]

'আগুনের ভিতর' গল্পেও নন্দিনীর ভিতর দিয়ে আসলে গল্পকার দেখেছেন বিহারের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা ভূমিহীন হরিজন শ্রমিকদের মধ্যে মিশে গেছে দমদম বেলঘরিয়ার প্রায় বাতিল হয়ে যাওয়া দুই প্রৌঢ়। বিস্তৃতির আঁধারে তলিয়ে যাওয়া লেখক অমলেন্দুশেখরকে হঠাৎই লেজেন্ড প্রমাণ করার দায়িত্বটা কতটা মেকি ও লোকদেখানো সে আর কারো বুঝতে বাকি থাকে না। আর সেই মিথ্যেটাকেই প্রবলভাবে সত্যি করার জন্য গোপাল-রামরা মৃত্যুবাজি ধরেছে। চুল্লির ভিতর ঝলসে যাওয়া তাপে মরণ-নৈকট্যের বিনিময় তারা নন্দিনীকে ফিরিয়ে দিয়েছে তার হৃদয়ের স্বাভাবিক ক্ষমতা, উত্তাপ, শৈশবের স্পর্শলুব্ধতা; জাগিয়ে দিয়েছে বাবার প্রতি মৃত ভালোবাসাকে। এ গল্পে নন্দিনীর মাকে দেখি সাহিত্যিক স্বামীর সব স্বৈরাচার মুখ বুজে সহ্য করে নিয়েছে। কিন্তু 'সে তো আজকে নয়' গল্পে দীপের মা একুশ বছর বয়সে স্বামীর সব ব্যভিচারকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে, নিজের পায়ের নীচে মাটি খুঁজে নিতে চেয়েছে। রচনাকার 'দেশের ভিতরে দেশ' গ্রন্থের 'আমাদের কথা' অংশে বারবার মেয়েদের প্রতিবাদী স্বরকেই আহ্বান জানিয়েছেন।

সম্মানজনক প্রশাসনিক পদে দীর্ঘ ছত্রিশ বছরের কর্মজীবন, সেই সূত্রে পূর্ব ও মধ্যভারতের বিভিন্ন অঞ্চলকে কৌণিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার সুযোগ ও বিবিধ মানুষের সংস্পর্শের অভিজ্ঞতা অনিতা অগ্নিহোত্রীকে সাহায্য করেছে দৈনন্দিন জীবনের কত অসাম্য-শোষণ, কত বিনষ্টি-অপ্রাপ্তির হাহাকারকে সাহিত্যরূপ দিতে। গল্পকার অনিতা অশ্রুত কণ্ঠস্বরের পাঠোদ্ধার করতে চেয়েছেন, তা পেরেছেনও। গল্পে কথকের জবানিতে রচনাকারের নিজের স্বীকারোক্তি —

ISSN 2583-6706 (Online)

"একদিকে বেঁচে থাকার অনিঃশেষ ক্ষমতা যার মূল ও এক গভীর আনন্দ ও বিশ্বাস — অন্যদিকে মেধাহীন শোষণ, ক্ষমতার অপপ্রয়োগ, শিক্ষা ও জনসেবাকে পদে পদে রুদ্ধ করার চেষ্টা — এই দুয়ের মধ্যেকার ভূমিতে আমি এক প্রায় নিরস্ত্র সৈনিকের মতন নেমে পড়ি।"[৮]

অনিতা অগ্নিহোত্রীর গল্পে কখনো এসেছে নাগরিক জীবনে বিবেকের অন্তর্ঘাত, কখনো বা নিরাপত্তাহীন জনসমষ্টির মনস্তত্ত্ব, কখনো বেআব্রু হয়েছে রাষ্ট্র পরিকাঠামোর ত্রুটি-বিচ্যুতি, কখনো সওয়াল উঠেছে নারীসুরক্ষা ও সমাজের নারীর স্থান নিয়ে। তাঁর কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ ঘুরে ফিরে এসেছে তাঁর লেখা গল্পে। আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন দেশের ভিতর আরেক দেশকে। কোথাও তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে ঠাঁই দিয়েছেন গল্পের বয়নে, কোথাও বা প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাকে সম্প্রসারিত করে নিয়েছেন অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যে। তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎ ও রূপায়ণের জগৎ মিলেমিশে গেছে। তাই অনিতা অগ্নিহোত্রীর ছোটোগল্পকে তাঁর অভিজ্ঞতার সংহত শিল্পরূপ বলা চলে।

উৎসের সন্ধানে :

১। 'আমার কথা', অনিতা অগ্নিহোত্রী, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, জানুআরি ২০১৮, পৃ. ৭
২। 'দূরের যাত্রায়', অনিতা অগ্নিহোত্রী, দেশের ভিতর দেশ, কলকাতা ০৯, অনুষ্টুপ, ডিসেম্বর, ২০১৩, পৃ. ৩৯
৩। 'বলকার ভালো দিন', অনিতা অগ্নিহোত্রী, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, জানুআরি ২০১৮, পৃষ্ঠা ১৩৩
৪। 'অতলস্পর্শ', অনিতা অগ্নিহোত্রী, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, জানুআরি ২০১৮, পৃ. ৪৭-৪৮
৫। 'অতলস্পর্শ', অনিতা অগ্নিহোত্রী, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, জানুআরি ২০১৮, পৃ. ৪৫
৬। 'চলিষ্ণু মৃত্তিকা, নদী, মানুষ, আয়লার পর সুন্দরবন', অনিতা অগ্নিহোত্রী, দেশের ভিতর দেশ, কলকাতা ০৯, অনুষ্টুপ, ডিসেম্বর, ২০১৩, পৃ. ১৮৪
৭। 'খেলাঘর', অনিতা অগ্নিহোত্রী, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, জানুআরি ২০১৮, পৃ. ১৬১
৮। তদেব, পৃ. ১৬১

লেখক পরিচিতি :

মাম্পি দেবাংশী : বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী। বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত